অন্তরঙ্গ আলোকে
চারণ কবি সামছুল হক মোল্লা
প্রকৌঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন

সেই আশির দশকের গোড়ার দিকের কথা। যখন চাঁদপুর কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক হেলালউদ্দিন আহমদ কলেজ ম্যাগাজিনে একটি আর্টিক্যাল লিখলেন আমাদের চাঁদপুরের একজন গুণী মানুষকে নিয়ে। যিনি চাঁদপুরের রত্ন এবং অহংকার। অথচ দুর্ভাগ্য আমাদের! আমরা তাকে চিনিনা। তিনি চারণ কবি সামছুল হক মোল্লা। চাঁদপুরের না হয়েও প্রফেসর হেলাল আমাদেরকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। ঠিক তখনই আমার দৃষ্টি সেদিকে ঘুরে যায়। সময়ে পরিচিত হই। অধ্যাপক হেলালউদ্দিন আহমদ ওনাকে চাঁদপুরের মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে পরিচিত করে তোলার লক্ষ্যে চাঁদপুর টাউন হলে একটি সংবর্ধনার ব্যবস্থা করলেন। তখনকার বাংলা একাডেমী পরিচালক কবি আসাদ চৌধুরী সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তার কিছুকাল পরই স্বইচ্ছায় আমি প্রবাসের বনবাসে। বিদেশের এই বনবাসে থেকেও বারবারই তাগিদ অনুভব করতাম মোল্লার জন্যে কিছু একটা করা দরকার। অবশেষে মরুপলাশ এবং রুপসীচাঁদপুর এর প্রতিনিধি আসিফ ইসলাম এবং মরুপলাশ গ্রুপের নিয়মিত লেখক কবি ও কথাশিল্পী ইঞ্জিঃ দেলোয়ার হোসেন কে ফোনে অনুরোধ করি চারণ কবি সামছুল হক মোল্লার একটি সাক্ষাৎকার জরুরী মরুপলাশ গ্রুপের জন্যে। ওনারা আমার কথা রক্ষা করেছেন। এক আকাশ শুভেচ্ছা তাদের। (১৯৮৮সালে মরুপলাশ এর প্রথম বর্ষপূর্তি সংখ্যায় মোল্লা সাহেব মরুপলাশ এর জন্য একটি শুভেচ্ছা পাঠালেন। সেই একই সংখ্যায় কবির দেয়া শুভেচ্ছার পাশাপাশি ওনার জন্য আমার লেখা একটি কবিতা সে সংখ্যায় প্রকাশ করি। এ লেখার শেষভাগে সুপ্রিয় পাঠক কবির শুভেচ্ছা এবং কবিকে নিয়ে লেখা আমার কবিতাটি খুঁজে পাবেন।).....সম্পাদক, মরুপলাশ, মোহনা, রুপসীচাঁদপুর..রিয়াদ, সউদী আরব। ২৬জুলাই২০০৬ইং।

পঁচিশ আষাঢ় চৌদ্দশ' তের বঙ্গাব্দ। সারা রাত আকাশ ভেঙ্গে দুর্দান্ত বর্ষা তার দানবীয় শক্তির মদমত্ততা নিয়ে অবিরাম ধারায় ঝরেছে। আমি শঙ্কিত ছিলাম ভোরে সূর্যের মুখ দেখব কিনা? যদি বৃষ্টি তার বর্ষণ না থামায়, আমরা কেমন করে ঘরের বাহির হবো। রাতে যখন ঘুমাতে যাই, তখন বাতাসের শরীর ভারী ছিলো পানিতে। আবহাওয়া ছিলো দারুণ গুমোট, অস্বস্তিকর, অসহ্য ভ্যাপসা গরম সত্ত্বেও তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলাম। ভোরেই 'ফুলছোঁয়া' যেতে হবে।

মাঝ রাত থেকেই শুরু হলো ভারী বর্ষণ। অঝোর ধারায় বারিপাত, ভোর রাতে হিম হিম শীতের একটা আমেজ সৃষ্টি হলো। দারুণ উপভোগ্য ও মধুময় ঘুম নামলো দুটো ক্লান্ত চোখে। তারপরও হৃদয়ের টানে ভোরের আলো ফোটার আগেই ঘুম ভেঙ্গে গেলো। শয্যা থেকে টেলিফোন করি রূপসী চাঁদপুর ওয়েব সাইটের বাংলাদেশ প্রতিনিধি আসিফ ইসলামকে। ওপার থেকে শব্দ আসে, আমি তৈরি।

আমাদের অবাক করে যাত্রা শুরুর লগ্নে বৃষ্টি তার বর্ষণ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। ভাবলাম হয়তো প্রকৃতি আজ তেমন বৈরী হবে না। আমরা দু'জন খুব ভোরেই যাত্রা করি চাঁদপুর শহর থেকে ১৭ কিলোমিটার দুর গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। আমাদের সাথী একটি ডিজিটাল ক্যামেরা। সুদুর সৌদী আরব থেকে ইন্টারনেট ভিত্তিক ওয়েবসাইট **রূপসী চাঁদপুর**-এর সম্পাদক (তিনি মরুপলাশ এবং মোহনা নামক আরও দুটি সাহিত্যপত্রেরও সম্পাদক। যাকে পৃথিবীর যেকোন স্থান থেকেই সহজে পাওয়া যাবে এই ঠিকানায়- www.marupalash.com) দেওয়ান আবদুল বাসেত, আষাঢ়ের শুরুতে আমাদের অনুরোধ করেছিলেন, চারণ কবি মুকুন্দ দাশের পর, বাংলার সবচাইতে শ্রেষ্ঠ চারণ কবি সামছুল হক মোল্লার একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও কিছু ছবি সংগ্রহ করে তার ওয়েব সাইটে পৌঁছে দিতে।

দেওয়ান আবদুল বাসেতের অনুরোধের পর পরই দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠের প্রধান সম্পাদক, চারণ কবি সামছুল হক মোল্লার অপরিমেয় স্নেহভাজন অপর ব্যক্তিত্ব কাজী শাহাদাত কবির ছয়টি প্রকাশিত বই (১। জওয়াব দাও বাংলদেশ ২। দেশের মালিক কান্দে ৩। ফরিয়াদ ৪। ভুলব না ৫। গরীবের কথা ৬। সময়ের ডাক) আমার হাতে তুলে দিয়ে, কবি তীর্থ ফুলছোঁয়া যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন।

দুটো অনুরোধের সাথে আমার নিজেরও একটি তাড়া ছিলো। বহুদিন থেকে অন্তরে একটা তাগিদ অনুভব করেছিলাম একবার তাঁকে দেখি। দর্শন আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিলো চিত্তে। সেই কবে কিশোর বেলায় দেখেছিলাম তাঁকে, সুন্দর করে কথা বলতেন, কবিতা আবৃত্তি করতেন, কৈশোর পেরিয়ে আমি যৌবনের চৌকাঠে পা রেখেছি সবে, দেশ তখন গণআন্দোলনে উন্মাতাল, স্বাধিকারের দাবিতে বাংলার গণমানুষ সোচ্চার।

উনসত্তরের দুর্বার গণ আন্দোলনে বাংলাদেশের শহর-বন্দর-গ্রাম-গঞ্জ সে সময় দারুণ উত্তপ্ত। চারদিকে বারুদের গন্ধ আর স্বজনের লাশ। চারণ কবি সামছুল হক মোল্লার সাথে তখন আমার পরিচয়ের নিবিড়তা বেড়েছে। তারপর একসাথে পাঠান বাহিনীর সক্রিয় যোদ্ধা হিসেবে রণাঙ্গনে লড়েছি আমরা।

মরুপলাশ, রুপসীচাঁদপুর ও মোহনা'র পক্ষ হতে চারণ কবি শামছুল হক মোল্লার সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন কবি ও কথাশিল্পী ইঞ্জিঃ দেলোয়ার হোসেন। তার সঙ্গে সহযোগিতায় ছিলেন রুপসীচাঁদপুর এর বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি আসিফ ইসলাম। এই কবি তার ফুলছোঁয়া বাড়ির আঙ্গিনায় বসেই সাক্ষাৎকার দেন।

কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত চাঁদপুর মহকুমার ফুলছোঁয়া গ্রামে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ আর সহজ সরল জীবন ধারার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ডাকাতিয়া নদীর শাখা খাল। গাছগাছালির ছায়ায় পাখির কলতানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গান গাইতে গাইতে স্কুলের পথ ধরে চলেছে একটি বালক। পরনে সাদা ধুতি ও ফতুয়া।

পার্শ্ববর্তী স্বর্ণা গ্রামের জমিদার রাজেন্দ্র বাবু বাকিলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মেধাবী এই বালকটিকে খুবই স্নেহ করেন। সৎ সাহস ও পরোপকার বালকটিকে সবার প্রিয় করে তুলেছে। এই বালকই কালক্রমে বাংলা ভাষার লোক সাহিত্যের অন্যতম প্রবাদ পুরুষ, চারণ কবি সামছুল হক মোল্লা হিসেবে নিজেকে খ্যাতিমান করে তুলেছেন। সাহিত্যাঙ্গনে রেখেছেন অমোছনীয় একটি ছাপ।

১৯৬৯,৭০,৭১ সনের সংগ্রামী সাহসী মানুষটি এখন কেমন আছেন, জানতে বড় ইচ্ছে করে। আসিফ আর আমি বৈশাখী পরিবহনের একটি বাসে চড়ে বাকিলা বাজারে এসে নামলাম। সবে ভোর হয়েছে, বাজারের সবগুলো দোকান তখনো খোলেনি। একটি রিকশা নিলাম, রিকশা চালক পার্শ্ববর্তী স্বর্ণা গ্রামের।

জিজ্ঞেস করলাম, সামছুল হক মোল্লার বাড়ি চেনো? তাৎক্ষণিক পাল্টা প্রশ্ন, কেন চিনবো না? বাকিলা-ছেঙ্গাতলী পাকা রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে স্বর্ণা, পূর্ব পার্শ্বে 'ফুলছোঁয়া' কবির ভাষায় 'ফ্লাওয়ার টাচ'। মাত্র পনর মিনিট পরেই পৌঁছে গেলাম মোল্লা বাড়ির দহলিজে। আসা যাওয়ার চুক্তিতে রিকশা নিয়েছিলাম ত্রিশ টাকা ভাড়ায়। রিকশা চালক কিশোর আবুল কালাম স্বভাব সুলভ চপলতার জন্যেই আমাদের অনেক কথা জানালো। ওর কাছেই জানলাম মোল্লা সাহেব সুস্থ আছেন, এখনো চলাফেরা করতে পারেন।

ফুলছোঁয়া মোল্লা বাড়িটি ইসলামী আবহে লালিত। ঢোকার পথেই একটি পাকা মসজিদ। তার পরপরই কাচারী ঘর। রিকশা থামতেই স্থানীয় কিছু লোক আমাদের ঘিরে ধরলো, বললোঃ মোল্লা সাহেবের কাছে যাবেন, তাই না? একজন লোক বললেন, চলুন। আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি এই বাড়ির? তিনি খুবই স্পষ্ট এবং গর্বিত কণ্ঠে বললেন, চারণ কবি সামছুল হক মোল্লার বড় ছেলে আমি। ক্ষণকাল পরে একটি চৌচালা টিনের ঘরে পৌঁছে গেলাম আমরা। প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতার একজন সৌম্যকান্তি পুরুষের সাথে দেখা হলো বাড়ির উঠোনে। মেপে চলেন, মেপে কথা বলেন, কিন্তু সদালাপী। আলাপে বিনয়ী, চলনে মার্জিত, চোখা চোখা কথা। তার অনুরোধে বসার ঘরে গিয়ে বসলাম।

আলাপের শুরুতেই টের পেলাম কথায় ও কাজে সুরুচির সম্ভার। শিল্প সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নিজের সারা জীবনটা একবার প্রদক্ষিণ করে আসলেন। স্মৃতিচারণ করলেন নস্টালজিক বিষয়ের। নিজের শিল্পী জীবন, কর্ম, সেই সাথে আপন সময়টিকে একের পর এক কথার মালা দিয়ে সাজিয়ে তুললেন তিনি। চিন্তা আর কর্মে নিজের কাছেই জেদী তাই কবি। হার না মানার প্রত্যয় সেই জেদের মধ্যে সুস্পষ্ট। কবিতার অবয়বে সৃষ্ট চোখে পৃথিবীকে দেখার আনন্দ তার বুকের নিঃশ্বাসে। কবির জন্ম ১৯২৩ সালে হাজীগঞ্জ থানার এই ফুলছোঁয়া গ্রামে।

আলোচনা থেকে আমরা অনুভব করলাম অভিজ্ঞতা তাঁর সীমাহীন। তাঁর সময়ের ঘটনাবহুল অনেক ভালো-মন্দ প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞজন তিনি। গোটা বাংলার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির উত্তরণের উজ্জ্বল অধ্যায়গুলোকে তিনি যেমন দেখেছেন তেমনি পর্যবেক্ষণ করেছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আর তার ভয়ঙ্কর দুঃসময়কে। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে মানুষের দুর্গতি দেখেছেন। তিনি কখনো সাথী হয়েছেন দুর্ভিক্ষের। প্রত্যক্ষ করেছেন দেশভাগ আর সেই সময়ের ঔপনিবেশিক শাসকচক্রের রাজনীতিসৃষ্ট মানুষের নিকৃষ্টতম সাম্প্রদায়িক ক্রোধকে।

নিজ জন্মভূমি ভাগের বেদনাকে উপলব্ধি করার অভিজ্ঞতা যেমন তাকে ধারণ করতে হয়েছে, তেমনি বাংলাদেশকে আপন করে পাবারও দু' দু'টি ঔপনিবেশিক শাসনের কুটিলতায় জীবনের সিংহভাগকে অতিক্রম করতে হয়েছে তাকে। উনিশশ' উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ও উনিশশ' একাত্তরের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের তিনি এক প্রত্যক্ষ সৈনিক।

দেখা হতেই সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেমন আছেন? উত্তর দিলেন অনেক পরে, কেমন আছি জিজ্ঞেস করার তুমি কে? তোমার পরিচয় দাও? ভীষণ ক্ষোভ তার মনে। চুপ করে থাকলাম ক্ষণকাল, ফিরে তাকালাম পেছনে। মনে হলো জীবনের প্রতি তার একটা বিতশ্রদ্ধভাব এসেছে। সারা জীবন মানুষের জন্যে কাজ করে গেছেন তিনি, গণসঙ্গীত গেয়ে, কবিতা লিখে বঞ্চিত মানুষকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন। দীর্ঘদিন তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ নেই, অভিমান তার হতেই পারে।

অধিকার আছে যার, সে-ই অভিমান করে। ব্যক্তি মানুষের কিছু সম্পর্ক থাকে এমন, যেখানে মান-অভিমান মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কবি শিল্পীরাও এর ব্যতিক্রম নন। তাদের ঘিরেও আছে নানা প্রিয়জনেরা। অভিমান করেন সেই কবি শিল্পীরা ভক্তের ওপর। কবিও অভিমান করতে পারেন তার ভক্তের ওপর। আমিও কোনো এক সময় তার খুব নিকটজন ছিলাম।

ব্যক্তি জীবনে কবি নিতান্ত একজন আবেগী মানুষ, অভিমান সঙ্গত। ভাবলাম, মান ভাঙ্গানোর উদ্যোগ নিতেই হয়...। প্রিয় মানুষের অভিমানের খেয়া ভেসে যায়। আমার কৈফিয়তগুলো কবি সহৃদয়তার সাথে গ্রহণ করলেন। অভিজ্ঞতার বর্ণনা নির্ভর বিশেষ বিশেষ ক্ষণগুলো নিয়ে আলাপ জমে ওঠল।

মরুপলাশ গ্রুপের নিয়মিত লেখক কবি ও কথাশিল্পী ইঞ্জিঃ দেলোয়ার হোসেনের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন বয়োঃবৃদ্ধ চারণ কবি সামছুল হক মোল্লা।

মনে পড়ল পঁয়ত্রিশ কিংবা সাঁইত্রিশ বছর পূর্বের কথা। তিনি যখন তার সৃষ্ট ফসল নিয়ে মোড় ফিরেছেন এবং আমূল পাল্টে দিয়েছেন গতানুগতিক ধারণা, তখনো কোনো বিলোড়ন হয়নি বরঞ্চ পাঠক অনুপ্রাণিত হয়েছে। তার সৃষ্ট গণসঙ্গীত সে সময়ের যুব শক্তিকে সাহস জুগিয়েছে। বড় মাপের রুচিমান একজন সৃষ্টিশীল মানুষ কোন কোন সময় আড়ালেই থেকে যান। সমকাল তাকে নিয়ে খুব একটা স্পন্দিত হয় না।

কিন্তু সত্যভাষী মহাকাল তাকে তুলে আনে স্পষ্ট করে তার কৃত কর্মকে। সাহিত্যকর্মে যার রয়েছে অসামান্য জীবন উপলব্ধির নতুন মাত্রা ও গ্রহণ, তিনি কেন এমন প্রচ্ছন্নেই রয়ে গেলেন সেটাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। হয়তো তার প্রতিবেশ এবং স্বভাবও এর জন্য দায়ী।

তিনি বাকিলা উচ্চ বিদ্যালয়ের নিষ্ঠাবান শিক্ষক হিসেবে নিজেকে নিবেদিত রেখেছিলেন অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত। সাংবাদিক ছিলেন, অন্যের খবর সংগ্রহ করেছেন, নিজে খবর হননি। বর্তমানে অবসর জীবন-যাপন করছেন সাহিত্য চর্চাকে সঙ্গী করে। তার সহস্রাধিক অপ্রকাশিত কবিতার পান্ডুলিপি দেখলাম। তক্তপোসের আধা ময়লা ধুসর বালিশের মতোই কবির শিয়রে পড়ে রয়েছে পান্ডুলিপিটি। কবি মাঝে মধ্যে হাতে নিয়ে দেখেন তার হাজার বিনিদ্র রাতের শ্রমলব্ধ কবিতার ধুসর পান্ডুলিপিটি।

জানলাম আমাদের জাতীয় জীবনের বহু ঘটনা সেখানে বিধৃত হয়ে আছে। অনেক কষ্ট আর শ্রমে রচিত কবিতাগুচ্ছ কোনো দিন ছাপার অক্ষর পাবে কিনা কবি তা জানেন না, যেমন জানি না আমরা তার ভক্তরা। যদি কোনো দিন সুসময় আসে তখন হয়তো পান্ডুলিপির খোঁজে কোন সুধীজন আসবেন এই ফুলছোঁয়া গ্রামে। ততদিন পর্যন্ত ধুসর ধুলায় ঢাকা পড়ে থাকবে সহস্র বিনিদ্র রজনীর কষ্টসাধ্য শ্রমের ফসল, মূল্যবান কবিতার পান্ডুলিপিটি। জীবন যুদ্ধে পরাজিত চারণ কবি আজ শক্তিহীন-সামর্থ্যহীন। স্বীয় উদ্যোগে অর্থাভাবে কবিতার বইটি ছাপাতে পারছেন না তিনি। কারো কাছে

ধর্ণা দেওয়ার মানসিকতা তাঁর নেই নিজের সৃষ্টিকে অবয়ব দিতে। এই কবি বড়ই প্রচারবিমুখ। প্রচার বা আত্মপ্রচার একালে একটি অনিবার্য বিষয় বলে যারা বিশ্বাস করেন, তাদের সেই বিশ্বাসকে তিনি আহত করেন না। অর্থাৎ কারও ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে আঘাত দেবার পক্ষপাতী তিনি নন। তারপরও প্রচারবিমুখতার কারণেই, তার অনেক সৃষ্টি ছাপার অক্ষরে তার প্রিয় গণমানুষের গোচরীভূত হচ্ছে না।

আলাপে কবি বলেন, দেশে দেশে একই কথা অনাদিকাল থেকে মানুষ ভেবে আসছে। 'ভিতরে সবার সমান রাঙা'ই শুধু নয়, তার শুভ ভাবনা, মানবকল্যাণ চিন্তা, লোকচরিত্র নিরীক্ষণের ধরণ-ধারণেও দারুণ ঐক্য বা সাদৃশ্য আছে।

''ঐ রাজা শ্রেষ্ঠ রাজা, যে পন্ডিতের কাছে যায়/ ঐ পন্ডিত নিকৃষ্ট পন্ডিত, যে রাজার কাছে যায়''- জার্মান লোকসাহিত্যের এই প্রতিধ্বনি আজও পৃথিবীজুড়ে বিরাজমান। সুশীল সমাজের প্রতিনিধি একজন কবি, সে সকল রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীর প্রকৃত ভূমিকাটি দেখিয়ে দেয়। চারণ কবির রচিত কবিতাগুলো দার্শনিকদের দেয়া নৈতিকতার প্রকাশ।

প্রতীতিগুলো খেয়াল করলে দেখা যায়, সমাজকে সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত রাখার জন্যে প্রণীত যে যে আচরণ নৈতিকতার খাপে মাপে মেলে-জগতজুড়ে তার চেহারাটা একই রূপ। কবি বলেলন মানুষ মানুষকে পর্যবেক্ষণ করে। একই সঙ্গে তার রসবোধের অন্তরঙ্গ পরিচয় উপলব্ধি করে।

আমাদের সরাসরি আলাপে আসা দরকার। শুরুতে আসে কবিতার উৎপত্তি-শ্লোক থেকে শোকের ধারা, বেদনাবিদ্ধ মন থেকে কবিতার জন্ম-এসব প্রসঙ্গ। কবিতার শ্রেণীবিভাগে তিনি প্রথমেই নীতি কবিতার পরিচিতি দিয়েছেন, জানিয়েছেন মানুষের জীবনকে মানবিক বিকাশ ধারায় ধাবিত করাই কবিতার মুখ্য উদ্দেশ্য।

তার কথানুযায়ী বলা যায়, বেদনাবিদ্ধ মন থেকে জন্ম নেয় কবিতা আর বিবেকবিদ্ধ মন থেকে জন্ম নেয় চারণ কবিতা। তিনি বৈদিকগ্রন্থ, ত্রিপিটক, রামায়ণ, মহাভারত, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ-বাইবেল, কোরআন, হাদিস এবং দেশী-বিদেশী প্রবাদ-প্রবচন, লোককথাগুলো পরবর্তীকালে কীভাবে তার কবিতার রসদ জুগিয়েছে, সে বিষয়ে বেশ কিছু চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত হাজির করলেন। আলোচনার আসরে বেশির ভাগ সময় আমরা শ্রোতা। আমরা এর প্রতিটি ক্ষেত্রে কৃষক-শ্রমিকের শোষণ-বঞ্চনার প্রতি প্রতিবাদী একটি মনকে জেগে উঠতে দেখি। শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে এই সু-শিক্ষিত চারণ কবির প্রতি।

সামছুল হক মোল্লা জীবন, স্বভাবে এবং আচরণে একজন খাঁটি বাঙালি। রুচিশীল সাহিত্যের সাধক, সুস্থ কবিতা-সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ পাঠক এবং রুচিগ্রাহ্য সঙ্গীতের অনুরাগী তিনি।

এসবের প্রতি ভালোলাগার পরিধি তার স্বীকৃত। প্রকৃত রস-আস্বাদনের জ্ঞান প্রসারিত। সকাল সাড়ে সাতটা থেকে দ্বিপ্রহর বারটা পর্যন্ত এক নাগাড়ে সাড়ে চার ঘন্টা আলাপ করেছি চারণ কবির সাথে। তিরাশি বছর বয়সেও তার স্মরণ শক্তি অত্যন্ত প্রখর।

১৯২৩ সালে সমৃদ্ধ কৃষক কামিজ উদ্দীনের ঘরে জন্মগ্রহণ করার পর বাল্যকালের অবুঝ কিছু সময় ছাড়া সম্পূর্ণ জীবনটাই ব্যাপৃত রেখেছেন মানুষের সেবায়। সাহিত্যালোচনা ছেড়ে আমরা ফিরে আসি তার ব্যক্তি জীবনে।

কবির কোনো ভাই-বোন ছিল না। পিতার একমাত্র সন্তান তিনি। ১৯৪৩ সালে তাঁর পিতা কামিজ উদ্দীন মোল্লা মারা যান। পিতার মৃত্যুর দু'বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৪১ সালে বাকিলা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাস করেন তিনি। ১৯৩১ সনে সর্ব প্রথম কবিতা লেখেন, কবি তখন ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। ১৯৪৬ সালে ছাপার অক্ষরে তার প্রথম কবিতা দৈনিক নবযুগ পত্রিকায় ছাপা হয়। ১৯৪১ সালে কবি চাঁদপুর শাখা ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি হন। অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদের সদস্য জুনাব আলী মজুমদারের সাথে বিভিন্ন সভা সমিতিতে চারণ কবি সামছুল হক মোল্লা কবিতা আবৃত্তি ও গণ সঙ্গীত গাইতেন।

আমরা জানি, যে কোনো বড় মাপের সৃজনশীল চারণ কবি তার রচনায় সৃষ্টি করেন এক নিজস্ব জগত। সেই জগতের নির্মল বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে, পবিত্র জলে অবগাহন সেরে, অনির্বচনীয় সৌন্দর্য উপভোগ করে পাঠক কবি সৃষ্ট জগতের সারস্বত্য হৃদয়ে ও মননে ধরে বিদগ্ধ পাঠক উত্তীর্ণ হন জ্যোতির্ময় চেতনার স্তরে। অনিত্যতার উর্ধ্বে উঠে পাঠক নিজেকে আবিষ্কার করেন নিত্য সত্যের ভুবনে।

স্বাধীনতা পূর্বকালে সামছুল হক মোল্লার বিদগ্ধ ভক্ত ও পাঠক যারা ছিলেন, তারা কবির রচিত কবিতা, গণ সঙ্গীত থেকে মুক্তির প্রেরণা লাভ করতেন। কবি তার জীবনের দু'জন নারীর প্রেরণার কথা আমাদের কাছে ব্যক্ত করেন, একজন তার প্রথমা স্ত্রী লজ্জাতুন্‌নেছা। কবির পার্শ্ববর্তী গ্রাম মাতইন সর্দার বাড়ির মেয়ে ছিলেন এই পল্লীবালা লজ্জাতুননেছা। কবির সকল সংগ্রামে তিনি তার সাথী ছিলেন। তার মৃত্যুর পর ১৯৫১ সনে ২৭ বছর বয়সে কবি দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহ করেন। কবি স্ত্রী সামছুন্নাহার বেগম, শ্রীপুর পাটওয়ারী বাড়ির কেরামত আলী পাটওয়ারীর সুন্দরী, বিদুষী কন্যা। দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে তার তিন ছেলে, চার মেয়ে। কবির পরমাত্মীয়ারা সবাই তার সাহিত্য কর্মের ভক্ত, পূজারী। এরাই কবির আন্তর শক্তি। পরমাত্মীয়ের সাহায্য এবং সান্ত্বনা কবিকে আজো প্রাণবন্ত করে রেখেছে।

আহত-আপ্লুত হৃদয়, আনন্দ সন্ধানী আত্মা কবিতার কাছ থেকে পেতে চায় সঞ্জীবনী সুধা, প্রকৃতির মতো অব্যর্থ শুশ্রূষা, সহযাত্রীর সহমর্মিতা, অনুভবের স্বীকৃতি, অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য, অশ্রুর উৎস-ছোঁয়ার ঔদার্য, প্রাণের পুলক এবং আরো অনেক কিছু। চারণ কবি সামছুল হক মোল্লার কবিতার আবেদন উপেক্ষা করবার নয়। তাঁর শব্দ-সোনা আমাদের আকৃষ্ট করে।

যত শুনি, কান পেতে শোনার ইচ্ছা তীব্র হয় তত। তাঁর কবিতা পাঠ হৃদয়ে কম্পন ধরায়। আমরা তাঁর প্রকাশিত কবিতার বই পাঠ করে এই ধারণায় উপনীত হয়েছি, পাঠকের প্রাত্যহিক শর্তবন্দী সত্তার উত্তরণ ঘটেছে শাশ্বত শুদ্ধসত্তায়। কবি যে জগৎ নির্মাণ করেছেন তাতে উৎকীর্ণ তার নিজস্ব জীবনবোধ ও স্বকীয় রচনাবৈশিষ্ট্য। একজন মহৎ সৃষ্টিশীল চারণ কবি তার স্বকীয়তা-চিহ্নিত ও নিজস্বতা-নির্দিষ্ট জগৎ-বৃত্তে কখনোই বন্দী হয়ে থাকেননি। তিনি বারবার স্বনির্মিত বৃত্তের পরিধি ছাড়িয়ে, ক্রমাগত নিজেকেই নিজে অতিক্রম করেছেন। নিরন্তর সৃষ্টি করে চলেছেন নিত্যনতুন জগৎবৃত্ত।

আর এভাবেই ঘটতে থাকে তাঁর বৃত্ত থেকে বৃত্তান্তরে মহৎ সৃষ্টিশীল স্বাতিক্রমণ। লক্ষ্যাভিসারী অভিযাত্রা। তার প্রতিটি বৃত্তই পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, উজ্জ্বল ও অভিব্যক্তিময় এবং এক অন্তর্লীন সূত্রে পরস্পর গ্রথিত। সামছুল হক মোল্লা তাঁর কবিতা, গানে গণমানুষের কথা বলেছেন। তাদের ব্যথা-বেদনা সহৃদয়তার সাথে তিনি অবলোকন করেছেন। তাঁর চাষী পিতার কষ্ট তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন গভীরভাবে।

পিতার মৃত্যুর পর অভিভাবকহীন কবি জীবনের সকল ক্ষেত্রে অভাব-অনটন আর

নিরাপত্তাহীনতাকে উপলব্ধি করেছেন হৃদয় দিয়ে। আর তাই দিনমজুরি থেকে অর্থনীতির জমিন, যৌনতার খোলসে ভরা নারীর জিন্দা লাশ হয়ে যাওয়ার চিরায়ত দুঃসংবাদ শুনেছেন, বড়লোকের অন্ত ঃপুরের ক্ষমতার রাজনীতিতে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থান এবং বাণিজ্যে পরাজিত ভূলুণ্ঠিত বাঙালির হতাশা তার কবিতায় জায়গা করে নিয়েছে।

অভাব-বঞ্চনায় ছুঁয়ে যাওয়ার মতো জীবনধর্মী ঘটনাগুলো অথবা আরো বিস্তৃত জায়গা পেল না কেন, আরো মর্মঘাতী হলো না কেন তাঁর কবিতায়, এ প্রশ্ন করেছিলাম কবিকে। উত্তর পেলাম আমার সব কবিতা তুমি পড়তে পাওনি। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, দুঃখ রয়ে গেল আমার সব কবিতা ছাপার অক্ষর পেল না। চারণ কবি সামছুল হক মোল্লা বললেন, কবি লেখক দৃশ্যমান বাস্তবতার ভেতর সমান্তরাল আরেকটি বাস্তবতা, আরেকটি গল্প।

সে গল্প কেউ শোনে না, শুনতে চায় না। আমার ভেতর ভিন্ন এক ভাবনা চারিয়ে দিলেন কবি সামছুল হক মোল্লা। আমি ভেবে দেখলাম, পুনঃপাঠে প্রতিবারই আমরা একটি ভিন্ন যাত্রাপথ আবিষ্কার করি কবিতার মানচিত্রে। চারণ কবির কবিতাগুলো এখন বহুস্বর ও বহুপ্রবাহী। তাঁর পাণ্ডুলিপির অপ্রকাশিত কবিতাগুলো যদি কখনো প্রকাশিত হয়, তখন হয়তো আমরা পূর্ণাঙ্গ সামছুল হক মোল্লাকে পাবো।

সুধী পাঠক, যে কোন বিষয়কে কবির প্রকৃত কণ্ঠস্বরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়াই হয়তো কবির সংগ্রাম। সংগত কারণেই চারণ কবি সামছুল হক মোল্লার জন্যে এ সংগ্রাম অনেক কঠিন। কঠিন হলেও জীবনের এই বোঝাপড়াটাকে এড়িয়ে যেতে চাননি চারণ কবি। তার কবিতার কয়টি চরণ উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারলাম না-

''দেহ-পসারিনী বেচে পেটের জ্বালায় দেহ তার/ ঘটাও কেন অপমান অমূল্য রতন প্রতিভার/ গণপ্রেমই করবে তোমাদের মালিক গণশিরোপার'' তিনি তার অপর কবিতায় লিখেছেন, ''বৃটিশ দেখলাম পাকও দেখলাম দেখলাম বাংলাদেশ /আশায় আমরা বছর বছর হইয়া গেলাম শেষ। /পেটের খাওন পিঠে দিল, পাওয়ার বেলায় জেলখানা /কিছু কইতে গেলে বানায় বোবা, খোদার ভয়ও মানছে না।''

স্রোতে ভেসে যাওয়া খড়কুটোর মত সাধারণ মানুষের সামগ্রিক জীবনকে নিয়ে তার রচিত কবিতাগুলোতে জীবনের এক জটিল আবর্তময় রূপ ওঠে এসেছে। তার লেখা কবিতায় গণসঙ্গীতে তিনি ঘটনাগুলো ফুটিয়ে তুলেছেন এমন এক ভাষাশৈলীতে যা সাধারণ মানুষেরই ভাষা। যে কোনো সাধারণ মানুষের মনে হতে পারে এটা তারই ভাষা তারই কথা। এটাই- অর্থাৎ এই ভাষাই তার বড় সৃষ্টি।

চারণ কবি যখন বলেন, ''গর্ব আমার, স্বর্গ আমার জন্মভূমি বাংলাদেশ / প্রাণ থাকিতে কভু মোরা সইব না তার মলিন বেশ/ মাতৃভূমি দেশ জননী বিশ্বমাঝে নিঃস্ব নয়।'' তার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ পড়ার পর চারণ কবি সামছুল হক মোল্লার সৃষ্টির প্রতি কবিতা পিপাসু মানুষের আগ্রহ বেড়ে যায়। কবিতাসমূহ পাঠ করলে শুধু গ্রাম্য বা পল্লীবাংলার পাঠক নয়, নিসর্গপ্রেমী সংবেদনশীল নাগরিক মনও খুঁজে পাবে পরমাত্মীয়ের সান্ত্বনা।

সামছুল হক মোল্লার কবিতার আবেদন আমরা উপেক্ষা করবো কেমন করে ? তাঁর শব্দ, সোনা আমাদের দারুণ আকৃষ্ট করে। তাঁর রচিত গণসঙ্গীত সমূহ যত শুনি, কান পেতে শোনার ইচ্ছা তীব্র হয় তত। বলতে ইচ্ছে করে, কবি তুমি উচ্চারণ করো- মানুষের কথা 'শুনবো বলে আমি কান পেতে রই।' কবি সমাজ মনস্ক এবং প্রতিবাদী, মাঝে মধ্যে দিশারী। প্রচন্ড ঝড়ে টালমাটাল তরণীর দক্ষ মাঝি।

কবির ফরিয়াদ কবিতার একটি আহ্বান, *''ফরিয়াদ নয়, নয় প্রার্থনা, প্রয়োজন সংগ্রাম/ আর ভাবা নয়, সম্মুখে চল, কামিওনা বদনাম। / প্রাণের দামেও সত্য বাঁচাও, দাও গোর মিথ্যার। / মরণরে ভয় করে নাই লাভ, মরণ হবেই হবে, /পশুর অধম জীবন ধারণে বাহাদুরি কিবা তবে / এসো মানুষেরা, দুনিয়াতে আনি মানুষেরি অধিকার।''*

সমাজ সংসারব্যাপী গণমানুষের নিত্যদিনের যে সংগ্রাম, যে আলোড়ন, বিলোড়ন, সেসবের কথা বলতে বলতে স্বভাব কবি সামছুল হক মোল্লা খুব সচেতন নির্বিঘ্নতায় মানবিক আবেদনের কিছু ছাপ রেখে যান তাঁর রচনায়। তিনি প্রশ্ন তুলে ধরেন কিংবা তলে তলে বলেই ফেলেন অন্য কোনো কথা। যে কথা সাধারণ মানুষকে সকল প্রকার শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে সাহস জোগায়।

ছোট বেলায় আমি বাকিলা বাজার হয়েই আমার গ্রাম অলিপুর থেকে চাঁদপুর আসতাম, এক দুর্বার আকর্ষণে কবির দোকানে প্রায় প্রতিদিন যেতাম। কবির বাচনভঙ্গি, মুগ্ধকর অঙ্গভঙ্গি, বিশুদ্ধ উচ্চারণ আমাকে প্রীত করতো। তার অনেক পরে ১৯৭১ সনে রণাঙ্গনে যুদ্ধের ফাঁকে তার কাছেই শুনেছি গণচীনের মহান নেতা মাওসেতুং, বলি ভিয়ার চেগুয়েভরা, আমাদের এম. এন রায়ের গল্প, চিলি আলেন্দকে চিনেছি তার বর্ণনা থেকেই।

শোষকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠনের ইচ্ছে কবির ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের পূর্বেই ছিলো। সামছুল হক মোল্লা মাওলানা ভাসানীর সার্থক অনুসারী ছিলেন। তিনি শ্রমিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। 'ফুলছোঁয়া' গ্রাম ঘিরে অবস্থিত পার্শ্ববর্তী পল্লী সমুহের কৃষক যুবকদের সংগঠিত করে 'লাল কোর্তা' বাহিনী গঠন করেছিলেন তিনি।

সমাজ সচেতন কবি শুধু কবিতা লিখেই ক্ষান্ত হননি, তিনি আপন বলয়ে শোষিত কৃষক শ্রেণীকে সংগঠিত করে, শোষকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করার প্রয়াস পেয়েছেন। রাতের বেলা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে পল্লীর নিরক্ষর মানুষগুলোকে সাক্ষর শেখানোর চেষ্টা করেছেন। কতটা সফল হয়েছেন সেটা বড় কথা নয়, তার প্রচেষ্টা অনুকরণীয়।

(মাঝে) চারণ কবি সামছুল হক মোল্লার সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় আমাদের রূপসীচাঁদপুর প্রতিনিধি (সর্ববামে) আসিফ ইসলাম, (সর্বডানে) মরুপলাশ গ্রুপের নিয়মিত লেখক কবি ও কথাশিল্পী ইঞ্জিঃ দেলোয়ার হোসেন।

আলাপ প্রসঙ্গে কবির একজন অনুরক্ত ভক্ত কাজী শাহাদাত লেখককে জানিয়েছেন, চারণ কবির সাংবাদিক জীবনের অনুল্লেখিত বিষয় সমূহ। সাংবাদিকতায় ব্যাপৃত কবি ছিলেন একজন অকুতোভয় সাংবাদিক, তিনি সমাজকণ্ঠ পত্রিকা সম্পাদক ছিলেন কিছু সময়। তার লেখা এতই ক্ষুরধার তির্যক ছিলো, অনেক সময় বিভিন্ন পত্রিকা রাজ-রোষের ভয়ে সেগুলো প্রকাশ করতে সাহস পেত না।

কবি সেগুলো নিজে অর্থ ব্যয় করে ছাপিয়ে বিতরণ করতেন। কাজী শাহাদাত তার নিজের সাংবাদিক হয়ে ওঠার পেছনে চারণ কবির অবদানের কথা সততার সাথে স্বীকার করেছেন।

বাংলা ভাষার বিশুদ্ধতা ও রূপ নিয়ে কবি খুবই সচেতন ছিলেন। বাংলা ভাষার আদি

উৎস সম্পর্কে অনেকের ধারণা এটা পালিত বা সংস্কৃতি নির্ভর, কবি এটা স্বীকার করতেন না। তিনি মনে করেন, প্রাচীন বং ঘরানার উত্তম সংস্করণ বর্তমান বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষায় এখন অনেক বিজাতীয় বা ভিন্‌দেশী ভাষার সংমিশ্রণ আছে। এতো কিছুর পরও বাংলা ভাষা তার ঐতিহ্য এ পর্যন্ত ধরে রেখেছে। চারণ কবি মনে করেন, কবি রবি ঠাকুরকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে প্রকারান্তরে বাংলা ভাষাকেই সম্মান করা হয়েছে।

তিনি আরো মনে করেন, হালে বাংলা ভাষা তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে কিংবা অচিরেই ঐতিহ্য হারাবে। আকাশ সংস্কৃতির এ জামানায় কেউ আর একে অপরের ব্যাপারে অজ্ঞ নয়। সবাই টিভি টিউন করে এক দেশ থেকে অন্য দেশে মুহূর্তেই চলে যেতে পারে।

ফলে তাদের ভাষা-সংস্কৃতি সবই দেখা এবং জানা সম্ভব হচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, আমাদের দেশের অনেকেই কিঞ্চিত হিন্দিতে নচেৎ ভুল ইংরেজিতে ভাব প্রকাশ করেন এবং সেই মাফিক চলেন। এ ব্যাপারে আলোচনা শুরু হলে কবি তাঁর কিছু বক্তব্য দিলেন, এবং তা কবি ঠাকুরকেই উদ্ধৃত করে।

কবিগুরু রবি ঠাকুর একবার খানিকটা উপহাসের স্বরে বলেছিলেন, যার মোটামুটি মর্ম, ''বাংলা ভুলে গেছো ভালো কথা, কিন্তু ইংরেজিটাও তো ভালোভাবে শিখতে পারোনি।'' কবিগুরু আরেকবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন, ভাষা সরস্বতীকে শাড়ি পরালেও আজকাল অনেক বাঙালি বিদ্যার মানহানি কল্পনা করেন। আসলে ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি এগুলো একটার সাথে আরেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

০৯

বাংলাদেশের ভাষা পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষা বা পৃথিবীর যে যে অঞ্চলে বাংলা ভাষা প্রচিলত রয়েছে সবকিছুর মধ্যেই নিজস্ব একটা স্বকীয়তা রয়েছে। কিছু কিছু শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটলেও নিজস্বতায় কোনো ছাপ ফেলতে পারেনি। স্মৃতি রোমন্থনে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা মনে করিয়ে দিলেন।

Captive Lady লিখে তিনি কীভাবে অপমানের মুখোমুখি হয়েছিলেন। খালি হাতে ফিরে এসেছিলেন বাংলার কোলে, স্বীকার করেছিলেন, ''হে বঙ্গ ভান্ডারে তব বিবিধ রতন।'' আর সৃষ্টি করেছিলেন, মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা, তিলোত্তমা সম্ভব-এর মতো বিশ্বমানের কাব্য গ্রন্থগুলো। তিনি যদি মানসিকতা পরিবর্তন না করতেন, তাহলে ইংরেজি সাহিত্যের ডোবায় কাদা-পানিতে নাকানি-চুবানি খেতেন। বাংলা সাহিত্যের দিকপাল মধুকবি হতে পারতেন না। আমি আর আসিফ তন্ময় হয়ে শুনছিলাম চারণ কবির বক্তব্যগুলো।

তাঁর সাহিত্যজ্ঞান, ভাষায় দখল আমাকে দারুণভাবে মুগ্ধ করছিলো। আমরা আবেগে আপ্লুত হচ্ছিলাম, কেমন করে সাড়ে চার ঘন্টা সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল, টের পেলাম না। মধুসূদন দত্ত নিজ ভাষা সংস্কৃতি ভুলে অন্য ভাষা সংস্কৃতির রঙে রঙিন হতে চেয়েছিলেন। ধর্ম পরিবর্তন করে নিজের নামের সাথে লাগিয়েছিলেন মাইকেল। চলন-বলনও ছিল তাদের মতোই। ট্যাক্সি ভাড়া করে মিটার দেখতেন না, হাতে যা আসতো, তা-ই দিয়ে দিতেন।

সেই তিনিও ফেঁসে গেলেন এবং ফিরে এলেন নিজ ভূমে কপোতাক্ষ নদের প্রেমে। অথচ আজ কী দেখি, সবাই আজ নেশাগ্রস্তের মতো অন্য দেশ, অন্য ভাষা, সংস্কৃতি মোতাবেক নিজেদের ভাবছেন এবং তা এমন পর্যায়ে গেছে, মাদক যেমন পুরো শরীর মাদকতার বিষে ঘিরে ফেলে, তেমনি বিজাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি আমাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

ভাষা সংস্কৃতি প্রসঙ্গে কবি এমনভাবেই তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, দিলেন সুচিন্তিত মতামত। তিনি বলে চলেছেন, আমরা মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতার মতো শুনে যাচ্ছি।

কবি পত্নী সামছুন্নাহার এরি মধ্যে আমাদের কাছে সহজ হয়ে গেছেন। নানা প্রকার খাবারের জোগান দিচ্ছেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি অধ্যাপক হেলাল উদ্দীন আহমদ, দেওয়ান আবদুল বাসেত, কাজী শাহাদাতের কথা স্মরণ করলেন। ২০০২ সালে দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ পত্রিকা কর্তৃক কবিকে দেয়া সংবর্ধনার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করলেন। আবার ফিরে আসি কবির বক্তব্যে ''আমরা কেউ আর নিজেকে স্বতন্ত্রভাবে ভাবতে শিখছি না।

সবাই নিজেকে হয় রক নচেৎ অমিতাভ বচ্চন অথবা মাধুরী, ঐশ্বরিয়া অথবা ব্রাডপিট ভাবতে শিখছি। সেই মতো চলতে চাচ্ছে আমাদের তরুণ সমাজ। আবহাওয়া ও জলবায়ুর হেরফেরে একেক দেশের ভাষা-সংস্কৃতি একেক রকম কিন্তু তারা বুঝতে পারেন না। আমাদের পাশের দেশ ভারতের রাজস্থানের ভাষা-সংস্কৃতির সঙ্গে তামিলনাড়ুর ভাষা-সংস্কৃতি মিলবে না। তাই আমাদের ভাষার নিজস্বতা ধরে রাখতে হবে। ভাষায় ও সংস্কৃতিতে অন্যদের উপস্থিতি অনুচিত।''

আমার ডাক নাম বাবু, ছোট বেলায় সবার সাথে কবি আমাকে এ নামেই ডাকতেন। দীর্ঘকাল পরে আবার বললেন, ''বাবু, দেওয়ান বাসেত আর কাজী শাহাদাতকে বলবে, তারা যেন অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে কলম ধরেন। আমার চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই, কখন হারিয়ে যাবো টেরও পাবে না। তুমি আমার শুভ কামনা সকল সাথীকে পৌঁছে দিও।'' নিজের অজান্তে চোখের কোণ অশ্রুসজল হলো, জানি না এ জীবনে আবার কখনো 'ফুলছোঁয়া' বা কবির ভাষায় 'ফ্লাওয়ার টাচ' গ্রামের মোল্লা বাড়িতে আসবো কিনা। যদি আসি তখন দেখা হবে কিনা চারণ কবি সামছুল হক মোল্লার সাথে? দুপুর বারটায় ত্যাগ করলাম 'ফুলছোঁয়া' মোল্লা বাড়ি। চারণ শব্দের আভিধানিক অর্থ কুলকীর্তিগায়ক, গণমানুষের স্তুতি পাঠক, গণমানুষের জন্যে যারা কবিতা বা সঙ্গীত রচনা করেন তারাই চারণ কবি। সে অর্থে সামছুল হক মোল্লা সত্যিকার অর্থেই চারণ কবি। চারণের বেশেই জীবনের তিরিশটি বছর অতিক্রম করেছেন এবং সততা ও নিষ্ঠার সাথেই গণমানুষের কথা রচনা করেছেন, আপন কণ্ঠে তুলে নিয়েছেন।

বিকেলে চাঁদপুর ফিরে আসলাম। কথা হলো কবির ভাবশিষ্য কাজী শাহদাতের সাথে, অনেক আলাপ হলো। কাজী শাহাদাত বললেন, আপনি হয়তো জানেন না, আমার সাংবাদিকতা জীবনে চারণ কবি সামছুল হক মোল্লার অবদানের কথা। আমি মুগ্ধ হলাম কাজী শাহাদাতের সরল স্বীকারোক্তিতে। কাজী শাহাদাত বললেন, চারণ কবি সামছুল হক মোল্লার ব্যাপারে সুসাহিত্যিক অধ্যাপক হেলাল উদ্দিন আহমদের একটি বাক্য প্রণিধানযোগ্য ঃ 'মুকুন্দ দাশের পর, বাংলার সাহিত্য আকাশে শুধু একজনই চারণ কবির খ্যাতি পেতে পারেন তিনি হচ্ছে সামছুল হক মোল্লা।'

চারণ কবি এবং তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী পত্নী সামছুন্নাহার বেগম

আবারো পেছনে ফিরে তাকানো, কী করে ভুলি চারণ কবি সামছুল হক মোল্লাকে। পিতার মতোই কবি দহলিজ পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিতে এলেন। আমাদের ত্রিচক্রযান বাকিলা বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলো, পেছনে তাকিয়ে দেখলাম তখনো শীর্ণকায় বয়োঃবৃদ্ধ অথচ ঋজু সামছুল হক মোল্লা দহলিজের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

জানি না কী ভাবছেন তিনি? কবি পত্নী সামছুন্নাহার বেগম ফিরে আসার সময় অনুরোধ করেছিলেন তার শুভকামনা কাজী শাহাদাত আর দেওয়ান আবদুল বাসেতকে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে, আমি পৌঁছে দিয়েছি তাঁদের শুভ কামনা। আসিফ ইসলাম একটি ক্যামেরা সাথে নিয়েছিলো, চারণ কবির কিছু আলোকচিত্র ধারণ করা হলো অতি আধুনিক ডিজিটাল ক্যামেরায়। ধারণকৃত ছবিগুলোই কিছু সময় পর্যন্ত আমার জীবনে তাঁর স্মৃতি হয়ে থাকবে। কামনা করি অনেক অনেক দিন বেঁচে থাকুন আমাদের গর্ব চারণ কবি সামছুল হক মোল্লা। তাঁর অপ্রকাশিত সহস্রাধিক কবিতা প্রকাশের জন্যে চিত্তবান কোনো সুহৃদ কি এগিয়ে আসবেন? প্রবন্ধটি শেষ করছি কবি বিরচিত ''কর মুক্ত এ ধরাতল' কবিতার কয়টি লাইন উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে। চরণগুলো নিম্নরূপ ঃ

এসো সত্যের সৈনিক ঠিক, এসো মিথ্যার যমদুত/ হাতিয়ার ধরো, নির্মুল করো দৈত্য-দানব সব ভূত।/ নয় দেরী আর, মুছাও এবার দুঃখী মানুষের আঁখিজল/ কর মুক্ত এ ধরাতল, কর মুক্ত এ ধরাতল।

ধরাতল মুক্ত হয়ে, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটলে তবেই চারণ কবি সামছুল হক মোল্লার প্রতি সত্যিকার শ্রদ্ধা জানানো হবে।

চাঁদপুর

বাংলাদেশ

২৫জুলাই ২০০৬ইং

একজন কবি ও তাঁর কবিতা

দেওয়ান আবদুল বাসেত

(চারণ কবি সামছুল হক মোল্লা শ্রদ্ধাভাজনেষু)

বয়সটি তাঁর ষাটের উপর গালভরা সব দাড়ি
কাশফুলের ওই মেলা মাথায় 'ফুলছোঁয়া তার বাড়ি।
নানা বলে ডাকছে কেহ কেউ বলে ভাই-দাদা
কেউ বলে ওই পাগলা বুড়ো একেবারে হাঁদা।

কিন্তু আমি জানতে পারি লোকটা খাঁটি কবি
গান কবিতায় জুড়ে আছে বঞ্চিতদের ছবি।
তাঁর কবিতায় নেই যে আপস শোষক যারা আছে
কুলি চাষী জেলে তাঁতী শ্রেষ্ট তাহার কাছে।

কিন্তু কবির গান-কবিতায় যাদের কথা বলে
কেউ বোঝেনা তাহার কথা দুঃখ চোখের জলে।
কেমনে ওরা বোঝবে তাহা শিক্ষা ওদের নাই
আমরা সবে দত্যি সেজে ওগের চেপে খাই!!

আমরা যারা নেতা-ফেতা মিষ্টি কথা দিয়ে
পাঁচ টাকাতে ওদের নাচাই মিছিল ব্যানার নিয়ে
ওরা সবে হুজুগ মাতাল সামনে দিয়ে লাফায়
মাথাল ফেলে মিছিল করে দিক-বিদিকে কাঁপায়!

লাগলে গুলী কুলির বুকে থাকবে নেতা দূরে
কুলির লাশে 'মওকা' এলে ভাষণ নতুন সুরে।
কপট নেতার ছল-চাতুরী বোঝবে কবে ওরা
এসব কথাই বলছে কবি জাগছে সাথী তোরা।

আপন দেশে পরবাসী তুই কবির গানে কয়,
লাঙ্গাল চলার নেই যে জমি লাফাস কেন তয়?
বাংলাদেশের তোরা মালিক তোরাই সেরা-বাছা
কেড়ে নেরে হিস্সা নিজের দেশকে এবার বাঁচা।

রুখে দাঁড়া কাল-নাগিনী যেমন ফনা তুলে
কাঁমড়ে দেরে ইতরগুলো রইবি নাকো ভুলে।
এসব কথা কবির লেখা লিখছে ক'যুগ ধরে
ভরাট গলায় গান গেয়ে যায় জেলে মাঝির তরে।

আপনভোলা এই যে কবি সবার তরে কাঁদে
সবার তিনি ঘুম ভাঙাতে বুকটি আশায় বাঁধে।
অর্থ যশ আর ফন্দি-ফিকির সকল ভুলে গিয়ে
লিখতে থাকে দিবা-নিশি শূণ্য পকেট নিয়ে।

পাতবে না হাত কারো কাছে কবি সজাগ খুউব
হার মানে না বাঘের কাছে না দেয় লোভে ডুব।
তাঁর যা মধু সব বিলায়ে চাকের মধু শেষ!
তবু তিনি হাসি খুশি যেন আছেন বেশ!

জানতে কেহ দেয় না তারে কারণ আছে কারণ!
তাঁর লেখা তাই পত্রিকাতে ছাপতে নাকি বারণ!?

চারণ কবি সামছুল হক মোল্লার 'মরুপলাশ' এর জন্য শুভেচ্ছা... (জুলাই ১৯৮৮ইং)

মরুর বুকে বালির ধরায়
ফুটলে যে মরুপলাশ,
সাবাস তাদের দিচ্ছি আমি
করল যারাই তোমার চাষ,
জাহেলিয়াত থেকে নাজাত
লভুক ধরার সকল লোক,
ঘোর তমসা দিক তাড়িয়ে
তোমার রঙিন লাল আলোক।
এই কামনা- নিখিল ধরা
তোমার রঙেই হোক রঙিন;
ফেতনা-ফাসাদ শেষ হয়ে যাক,
আনুক ধরায় নতুন দিন।
.....সামছুল হক মোল্লা।